লাপোড়িয়া

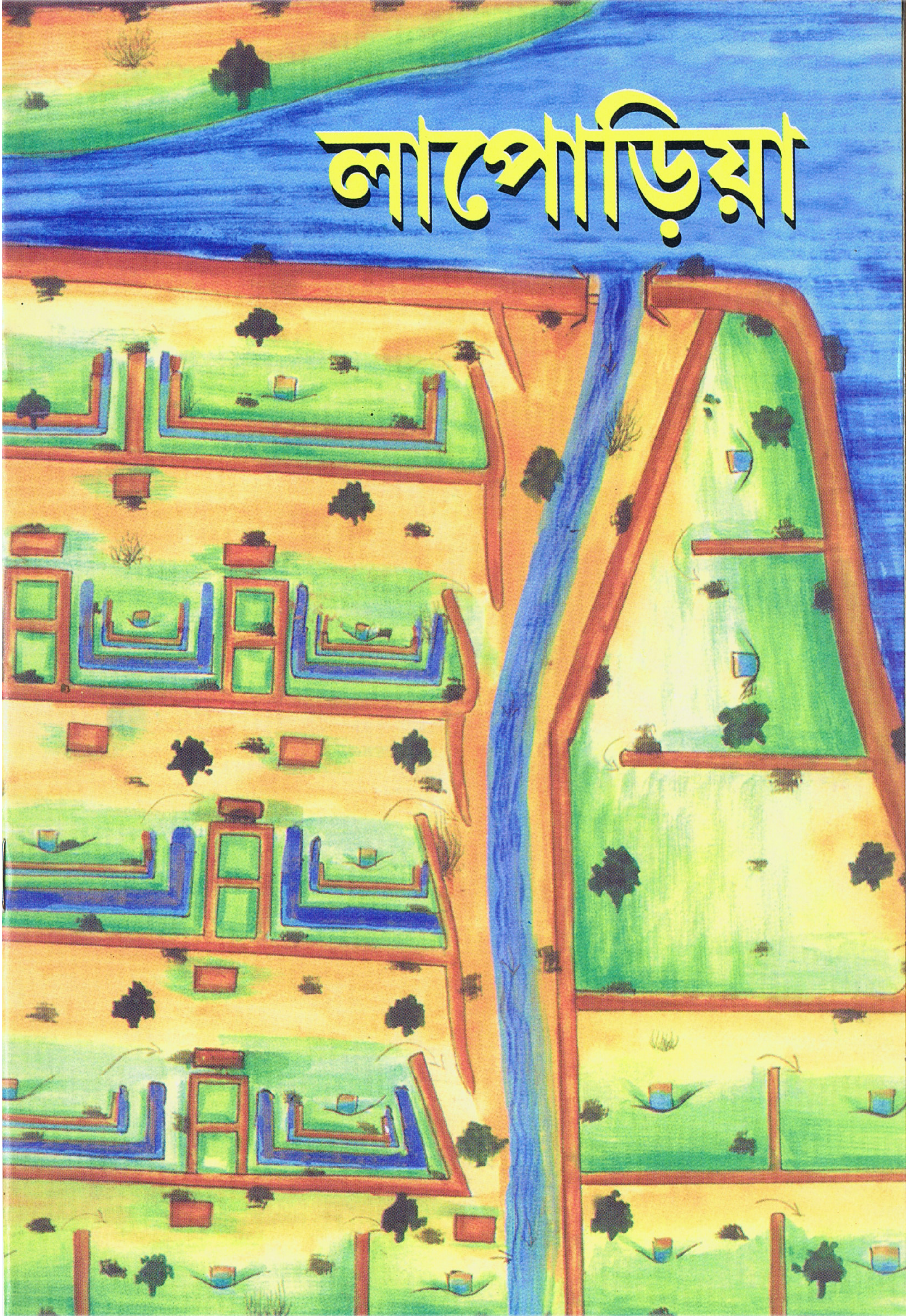

২০০ পরিবারের ছোট্ট গ্রাম লাপোড়িয়া আজ
জয়পুর ডেয়ারীকে প্রতিমাসে ২½ টাকার দুধ বিক্রি করছে।

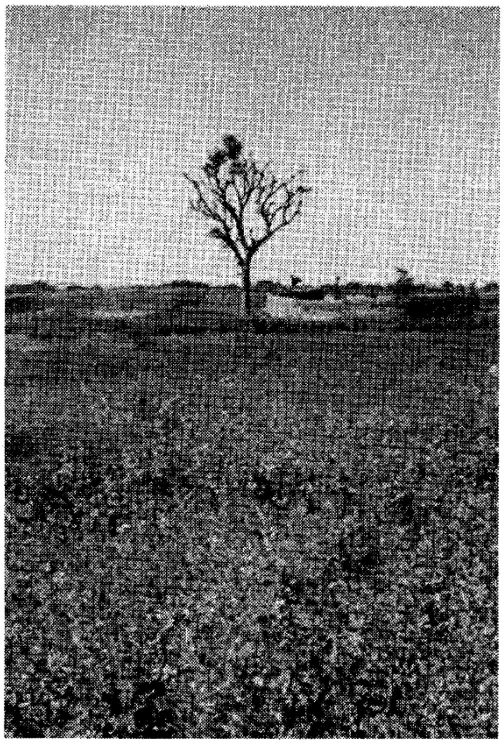

লাপোড়িয়া

একটি দৃষ্টান্ত

আশাবরী

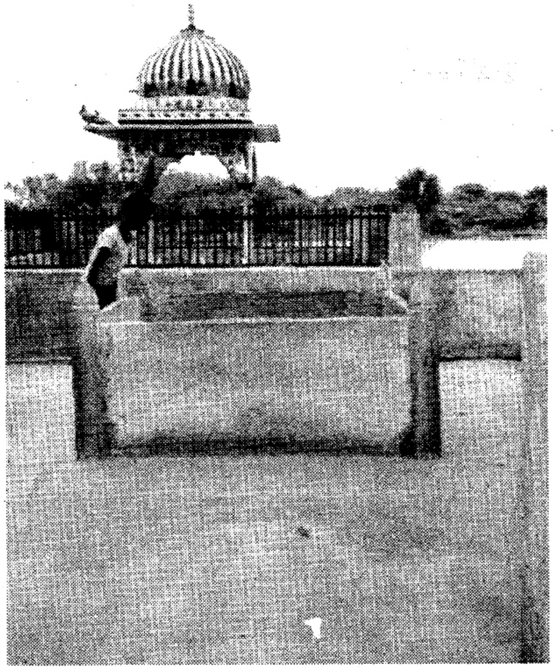

'LPODIA' EKTI DRISHTANTA

A Bengali Translation of

'GOCHAR KA PRASAD BANTTA LPODIA'

গ্রাম বিকাশ নবযুবক মণ্ডল লাপোডিয়া কর্তৃক হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত বই 'গোচর কা প্রসাদ বাঁটতা লাপোডিয়া'- এর বাংলা অনুবাদ ।

লেখক: অনুপম মিশ্র

অনুবাদ: নিরুপমা অধিকারী

সহযোগীতা : লক্ষ্মণ সিং, জগওয়ীর সিং

চিত্র : গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান, নতুন দিল্লী ও
গ্রাম বিকাশ নবযুবক মণ্ডল লাপোডিয়া

আর্থিক সহায়তা: Farhadji

বাংলায় প্রথম প্রকাশ : শুক্লা পঞ্চমি ১১.২.২০০৮ (11.2.2008)

প্রকাশক : আশাবরী। নেতাজী সুভাষ রোড। পুরুলিয়া - ৭২৩১০২। পশ্চিমবঙ্গ।
Netaji Subhas Road. Purulia-723102. (W..B).

কথা - (০৩২৫২) ২২৬৮৪৮/৯৪৩৪৩২৩৯৯৯/৯৪৭৪৫০৯৩২৩
(03252) 226848/ 9434323999/ 9474509323

মুদ্রক : ডি এন্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪পরগনা, কলি ১৩২।

মূল্য : ১০ টাকা

সন্ ২০০৪; লাপোড়িয়ার কাছে এ বছরটির অর্থ ৪+২ অর্থাৎ ৬ বছরের খরা। আশপাশের বহু গ্রামই এই খরায় বিপর্যস্ত। অথচলাপোড়িয়া আজও উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাপোড়িয়ার উন্নত মস্তকে কিন্তু কোন অহংকার নেই, রয়েছে বিনম্রতা। লাপোড়িয়ার মানুষ ৬ বছরের খরার সঙ্গে যুঝার চেষ্টা না করে, চেষ্টা করেছে বেঁচে থাকার উপায় খোঁজার। সে এক লম্বা পথ চলা। আর এই যাত্রায় লাপোড়িয়া শেকড় পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। যে শেকড় লুকিয়েছিল মাটির নীচে। শেকড়ই, মাটির ওপরের খরাকে ভুলে মাটির নীচের জলকে চিনতে সাহায্য করেছে। যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ ছিল এটি। এই পরিশ্রমই ৬ বছরের খরার পরও লাপোড়িয়াকে ভরপুর রেখেছে সবুজে।

কোন সমাজই শূন্যে বেঁচে থাকতে পারে না। তাকে নিজেদের সদস্যদের জন্য, পশু-পাখির জন্য, মাটির জন্য, গাছ-পালার জন্য, কুয়োর জন্য, বাঁধ-পুকুরের জন্য, চাষ-বাসের জন্য এমন কোন না কোন ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে হয়, যা সমাজসিদ্ধ ও স্বয়ংসিদ্ধ। কালের কোন খণ্ড বিশেষে সমাজের সকল সদস্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে যে ব্যবস্থা তৈরী হয়, সেটিকে সদস্যরা মিলেই আবার লালন-পালন করে বড় ও মজবুত করে তোলে। নিজেদেরই জন্য নিজেদের তৈরী করা অনুশাসন পূর্ব প্রজন্ম উত্তর প্রজন্মের কাছে সমর্পণ করে। এক প্রজন্ম তাদের জীবনকাল শেষ করার আগেই ঠিক একই রকম পরিপক্ক উত্তর প্রজন্ম উঠে আসে পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য— তখনই সামাজিক জীবন বিনা বাধায় অবাধ গতিতে চলতে থাকে।

এই যে নিয়ম ও অনুশাসন, যেগুলি সমাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করত, বিগত দু'শো বছরের নৈরাজ্যে তা অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যায়। যে জিনিসগুলি সমাজকে টিকিয়ে রাখত, সঞ্চালিত করত, তাদের প্রতিষ্ঠাই নষ্ট করে দেয় দুশো বছরের বিপর্যয়ের পর্যায়টি। পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, অথচ নতুন এমন কোন ব্যবস্থা উঠে এলো না যা সেই জায়গা নিতে পারে। লাপোড়িয়াও কোন বিশেষ গ্রাম ছিল না; তাই সেও এই ঝঞ্ঝার মুখে তার শক্তি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। উপকরণের অভাব পরিস্থিতির চাপে অন্য অনেক গ্রামের মতোই তার মাথাও নত হয়, ঝুঁকে পড়ে।

শেকড়ের সঙ্গে পরিচয়—

আজ লাপোডিয়া আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। নিজের শেকড়কে জানার-খোঁজার এই যাত্রা অবশ্য বেশ দীর্ঘ। ধৈর্য্য ছাড়া প্রকৃতিতে কোন কাজেরই ফল পাওয়া যায় না। বহুদিন আগেই গ্রাম লাপোডিয়া ভেঙে পড়েছিল। ক্ষেতে ফসল নেই, গোচারণভূমি শুকিয়ে কাঠ। গোচারণভূমির কিছু কিছু জায়গা বেদখল হতে থাকে। দুটো পুরনো পুকুর পাড় ভেঙে যাওয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে। এরকম দুর্দিনে লাপোডিয়ার মানুষ ৮০কিলোমিটার দূর জয়পুর শহরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। কোন এক সময় যে পরিবার পুরো গ্রামের অভিভাবকত্ব করত, এ হেন খারাপ সময় সে পরিবারের ভাল লোকেরাও গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও চাকরি করতে চলে যায়। এঁদেরই একজন হলেন লক্ষ্মণ সিং। গ্রামের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লক্ষ্মণ সিং। তখনও তাঁকে সম্মানের সঙ্গে 'বনাজী' বলা হোত। উজড়ে যাওয়া গ্রামের বানাজীও উৎপাটিত হয়ে দূরে কোথাও চলে যান। গেলে হবে কি, গ্রাম লাপোডিয়ার হয়তো বানাজীর কাছে বড় কোন কাজ আদায় করার ছিল; তাই বনাজী আলোয়ার জেলার তরুণ ভারত সঙ্ঘে গিয়ে পৌছান। সময়টা ১৯৮৮সাল। তরুণ ভারত সঙ্ঘ তাদের কাজ শুরু করেছে। সঙ্ঘে আসার আগে লক্ষ্মণ সিং নেহরু যুবক কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নেহরু যুবক কেন্দ্র চালনা

করে, ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রালয়। নেহরু যুবক কেন্দ্রের মাধ্যমেই তিনি তাঁর গ্রামের যুবকদেরও সংগঠিত করে 'গ্রাম বিকাশ নবযুবক মণ্ডল'-এর গঠন করেন। এ কাজটি যে তিনি খুব একটা চিন্তা ভাবনা করে করেছিলেন, তা নয়। তাছাড়া নবযুবক মণ্ডলের কোন কমিটিও ছিল না, আর তারা তেমন কোন নতুন কাজও করতে পারেনি। তবুও ১৯৮৪ সালের প্রথমার্ধে লক্ষ্মণজী গ্রামের যুবকদের সংগঠিত করে শ্রমদানের মাধ্যমে লাপোডিয়া ও আশপাশের আরো ১০টি গ্রামে কিছু

কাজ করেন। আর কোনদিন স্কুল যাওয়া হয়নি যে বাচ্চাগুলির তাদের জন্য একটি স্কুলও শুরু করেন।

খরায় উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রামে যে কিভাবে জলের রেখা ধরে খুশী ফিরে আসতে পারে সে রহস্যটি লক্ষ্মণজী তরুণ ভারত সঙেঘ, রাজেন্দ্রজীর সঙ্গে কাজ করতে করতে জানতে পারেন। তখন তিনি ভাবেন এই রহস্যের বাকি পরতগুলি খোলার চেষ্টা, তাঁর নিজের গ্রামে গিয়েই করা উচিৎ। লাপোডিয়ার বনাজী অর্থাৎ লক্ষ্মণজী লাপোডিয়া ফেরেন; আর তাঁর পেছন পেছন লাপোডিয়ার পুরোনো বৈভবও ফিরতে থাকে— সেই বৈভব যা বাইরে পালিয়ে গেছিল বিগত কয়েক প্রজন্মের মতোই।

ধরিত্রীর পূজা—

গ্রাম ছাড়ার আগে লক্ষ্মণজী খেলা-ধুলোর মাধ্যমে যে সংগঠন তৈরী করেছিলেন সেই সংগঠনকে কেন্দ্র করেই পিছনে ফেলে আসা গ্রাম-সেবা, গ্রাম-বিকাশ... ধরণের কাজগুলি আরম্ভ করেন। গ্রাম ছাড়ার আগে ১৯৮৪সালেও তিনি এ ধরণের কিছু কাজ শুরু করেছিলেন। কাজগুলির জন্য কোন পয়সা, বা কোন ধরণের বাজেট ছিল না। সর্বজনীন কাজের কোন বিশেষ বোধও বোধ হয় সেসময় ছিল না। সেসময় যে কাজগুলি করা মানুষজন বন্ধ করে দিয়েছিল, সেগুলি শুরু করার জন্যই ধীরে ধীরে পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছিল। এই তালিকায়— গ্রামের পশুগুলির জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, চাষবাস সবই ছিল। কোনদিন তারা গ্রামের উপেক্ষিত চকটি থেকে পরিস্কার করতে শুরু করত তো কোনদিন সারাদিন ধরে গ্রামে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে থাকা গোবরগুলি গুটিয়ে জড়ো করা হত; রাত্রে সেগুলি আবার ক্ষেতে দেওয়া হত। আবর্জনা পাল্টে যেত সারে। লক্ষ্মণজীর এই সমস্ত কাজের সঙ্গী ছিলেন বন্ধু রামঅওতার কুমাওত। দুই যুবক প্রতিদিন গ্রামের নষ্ট হয়ে যাওয়া পুকুর দু'টি দেখতেন। কি করে পুকুর দু'টি ঠিক করবেন! মনে হত এ কাজ তাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতার বাইরে। ১৯৮২সালে হঠাৎই একদিন গাঁইতি-কোদাল নিয়ে লেগে পড়েন বড় পুকুরটি ঠিক করতে। পুকুরটি ঠিক করতে কত বছর লাগতে পারে তা তাদের আন্দাজ ছিল না। গ্রামের মানুষ তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করে; বোঝায় এভাবে কিছু হবে না। এমন সময় গ্রামের প্রতিষ্ঠিত পূজারী স্বামী সিয়ারামজীও ধরীত্রির এই পূজায় যোগ দেন। শ্রী শৌকরণ বৈরওয়াও এবার এগিয়ে এলেন। চারজন মিলে সারাদিন মাটি কাটেন, আর প্রায় দুই প্রজন্ম থেকে ভেঙ্গে পড়ে থাকা পাড়ে ঝুড়ি ভরে মাটি ফেলতে থাকেন। ধীরে ধীরে পাড় ওপরে উঠতে থাকে। এঁদের ধৈর্য ও

পরিশ্রম দেখে কিছুদিন পর গ্রামের আরও ১৫-২০ জন মানুষ যোগ দেয়। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে কুড়ি জনের হাত কাজে লাগে। কুড়ি জনের হাতের সঙ্গে কুড়ি জনের মাথাও কাজ করে। একদিন মিটিংএ বসা হয়; সকলে মিলে ঠিক করা হয়— কাজটা গ্রামের সকলের, তাই সকলকে ডাকা উচিত।

গ্রামের ঘরে ঘরে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়— সকলে মিলে সকলের কাজের যে প্রচলন ভেঙে পড়েছিল তা আবার শুরু হয়। গরমের দুই মাসে গ্রামের বড় পুকুরটি ঠিক করা হল, কিন্তু প্রকৃতি বোধহয় এখনও আরও একবার লাপোডিয়ার পরীক্ষা নিতে চাইছিল! প্রথম বর্ষাতেই পুকুরটি ভেঙে পড়ে। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় লাপোডিয়া নিজেদের যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল, তারা কিন্তু অত সহজে ধৈর্য হারালো না। মাইকে ঘোষণা করে গ্রামের মানুষদের এক জায়গায় জড়ো করা হল, সকলে মিলে আলোচনা করে মাটি ভরা বস্তা ফেলে কোন রকমে পাড়টি রক্ষা করা হল। পরের বছর তরুণ ভারত সঙ্ঘের সহযোগিতায় পুকুরটি আবার ঠিক করা হয়, দশ বছর তপস্যার পর লাপোডিয়া ফিরে পুকুরের বরদান পায়। পুকুরে এত জল ভরে যে নীচের ক্ষেতগুলিতে চাষ করে অনেক পরিবারই বাঁচার সংস্থান করতে পারে। ১০০বিঘা, ১০০বিগোরি জমিতে সেচেরও ব্যবস্থা হয়।

হারিয়ে যাওয়া রেখাটিকে উপলব্ধির চেষ্টা—

এর মাঝে শ্রীলক্ষ্মণজী গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বই 'আজ ভি খরে হ্যায় তালাব' পড়েছেন (বইটির বাংলা অনুবাদও বেরিয়েছে। প্রকাশক— আশাবরী', সুপার মার্কেট, হাটতলা পুরুলিয়া, দোকান নং- সি ৩৬, পুরুলিয়া-৭২৩১০১। কথা-৯৪৭৪৫০৯৩২৩/৯৪৩৪৩২৩৯৯৯); সকলকে পড়িয়েওছেন। বইটি পড়ে সকলের এটাই মনে হয়েছে— যে ঐতিহ্যের কথা বইটিতে বলা হয়েছে, তা তো আমাদেরই ঐতিহ্য ছিলো। হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যটিকে আবার দৃঢ় ভাবে নিজেদের করে পেতে হবে।

বড় পুকুরটি ঠিক হয়ে গেলে গ্রামের লোকেরা আরও দুটি ছোট পুকুর মেরামতিতে হাত দেয়। এ পুকুর দুটি বড় পুকুরটিরও আগে তৈরী হয়েছিল। তারপর একটি সুন্দর অনুষ্ঠান করে পুকুরগুলির নামকরণ হয়। প্রথম পুকুরটির নাম দেওয়া হল- দেবসাগর, দ্বিতীয়টির- ফুলসাগর ও তৃতীয়টির- অন্নসাগর। নিয়ম তৈরী হল— প্রথম দুটি পুকুর থেকে জল নেওয়া যাবে না। ফুল সাগরের আশপাশে ভাল ভাল গাছ লাগানো হল, বাগান করা হল। দেবসাগরে সুন্দর পাড় হল, পাড়ে ছতরি বসানো হল, রাখা হল পাখিদের জল পানের ব্যবস্থা। তৈরী হল ধর্মশালা। তৃতীয় পুকুরটি থেকে প্রয়োজন মত

সেচের জল নেওয়া যাবে। প্রথমটি থেকে নিজেদের জন্য জল নেওয়া না গেলেও পশু, পাখি, গাছেদের জন্য জল নেওয়া যাবে,আর দ্বিতীয়টি থেকে নিজেদের জন্য ।

চাষের পরিস্থিতি কিছুটা শুধরানো গেল ঠিকই কিন্তু শুধু মাত্র চাষের ওপর ভিত্তি করে কৃষক টিকতে পারে না, পশুপালন তাঁদের অন্যতম বড় আধার। লাপোডিয়ার গোচর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিল। দেখাশোনার অভাবে গ্রামের সর্বজনীন এই জমিটি এখন আর কারোরই ছিল না। ঘাসের কথা ছেড়েই দিন, গোচারণের গাছগুলি পর্যন্ত একে একে কাটা পড়ে।

গোচারণভূমি উদ্ধার—

গ্রামের যে সর্বজনীন বুদ্ধি পুকুর মেরামতির কাজে লেগেছিল, সেই বুদ্ধিই ঠিক করল গোচারণেও কাজ হবে। আবার সবাই ছোট ছোট দলে বসলেন, আলোচনা হল, কিছু সিদ্ধান্তও নেওয়া হল— গোচারণভূমিতে কেউ কুড়োল নিয়ে ঢুকবে না, ঘাস খোঁড়া যাবে না, গোচারণভূমির কোন জীবকে মারা যাবে না, বরং তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের জন্য জলের ব্যবস্থা, তাদের বাসা করার বা ডিম দেওয়ার জায়গাগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কারণেই বড় পুকুরটি তথা অন্নসাগরের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা লাখেটাটিও সুরক্ষিত করার প্রস্তুতি নেওয়া হল। গোচারণের পুরোনো বৈভব স্মরণ করা হল। কোন একজন বয়স্ক ব্যক্তি বললেন লাপোডিয়ার গোচারণে এত গাছ ছিলো যে গ্রামের ছেলেরা গাছ থেকে গাছে চলার প্রতিযোগিতা করত। ঘাস ও গাছে ভর্তি গোচারণ নতুন স্বপ্নের আলোকে চোখের সামনে আবার একবার ভেসে উঠল। স্বপ্ন পূরণের কাজটি কিন্তু পুকুর মেরামতির তুলনায় অনেক বেশি কঠিন ছিল।

গোচারণ ঠিক করার সংকল্প তো নেওয়া হল অথচ কি ভাবে তা করা হবে তা কেউ জানত না; তাই সকলে মিলে ঠিক হল যেখানে যতটুকু শেখা যায় সেটুকুই লাপোডিয়ায় প্রয়োগ করা হবে। এ সময়টাতে সরকারী গ্রামীণ বিকাশ প্রকল্পে গোচারণভূমির কোন স্থান ছিল না। যে জমি একসময় জনসাধারণের ছিল এখন তা সরকারী জমি; যে সে যখন খুশি কব্জা করে বসছে। গোচারণভূমি ফিরে আবার ঠিক করা যায়— এ ধারণা কোথাওই ছিল না। তবুও লাপোডিয়ার 'নব যুবক' অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগাল। 'কন্টুর বন্ডিঙ্গ' বিষয়টি তাদের বলা হয়। লাপোডিয়ার মানুষ কন্টুরের কাজ দেখতে গেল।

আজমিরের কাছে তিহরী নামের একটি গ্রাম। এখানে বিশ্বব্যাঙ্কের মত নামজাদা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রচুর পয়সা খরচা করা হয় গোচারণভূমি পুনরুদ্ধারে। পাঁচ বছর গোচারণভূমিটি বন্ধ করে রাখা হল; পশুদের ঢুকতে দেওয়া হল না। প্রথম দিকে

গ্রামের লোক বেশ উত্তেজিত হয়ে রইল; পরে তো গোচারণভূমির সুরক্ষাসীমা লঙ্ঘন করে পশু ঢুকিয়েও দেওয়া হয়। সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর খামতির দিকটি যদি এখানে ছেড়েও দেওয়া হয়, তাহলেও টেকনিক্যালি যে কাজ এখানে করা হয়েছিল স্বয়ং প্রকৃতিও তা বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে চাননি। পয়সা ছিল প্রচুর, তাই মানুষ দিয়ে কোন কাজই করানো হলো না, করানো হল ট্রাকটার দিয়ে। ধৈর্যের দিকটিও উপেক্ষিত হল। ট্রাকটারে কাজ করানোর ফলে দেড় ফুট উচ্চতার কন্টুরের মাটি ভেতরে ভেতরে প্রচুর পরিমানে ফেঁপে রইল। ফলে প্রথম বর্ষাতেই বৃষ্টির চাপে কন্টুরের দেড়ফুট উচ্চতা দাঁড়ালো ছয় ইঞ্চিতে। ভারী বর্ষাতে জলের তোড়ে গোচর বিকাশের সমস্ত কাজ জলের সঙ্গেই জলে বয়ে গেল।

দীর্ঘ তৃষ্ণা—

এরকমই আর একটি কাজ— গোচর গর্ত করে আর্দ্রতা আনার চেষ্টা করা হয়। এখানেও সফলতা এল না। কারণ, বর্ষায় গর্তগুলি জলে ভরে থাকার ফলে ঘাস জন্মাতে পারল না। আবার গরমে গর্তের জল দ্রুত বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। মাটির ভেতর পরতে পরতে যে আর্দ্রতা জমা হয়েছিল তীব্র গরমে তাও দ্রুত শুকিয়ে গেল। যদি এই পদ্ধতিটি সফলও হত, তবুও এই পদ্ধতির কিছু ত্রুটি লাপোডিয়ার মানুষের নজরে পড়ে। এ কাজে বেশ অনেকদিন গোচারণভূমিটি আটকে রাখতে হয়; তাছাড়া যে কন্টুরগুলি তৈরী করা হল সেগুলি আশপাশের গ্রামগুলি থেকে বেরিয়ে আসা রাস্তার ওপর পড়ছে। নিজের গ্রামের লোক এধরণের অসুবিধাগুলি মেনে নিলেও, অন্য গ্রামের লোক কেন মানবে! আর গোচর বন্ধ করলে গ্রামের পশুগুলি যাবে কোথায় ?

এরকম বহু প্রশ্নেরই উত্তর না পাওয়া গেল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, না পাওয়া গেল আশপাশের কাজগুলি দেখে। লাপোডিয়ার মানুষ অবশ্য হাল ছাড়লো না। তাদের গোচারণভূমি প্রদক্ষিণও থামল না। এরকমই কোন এক প্রদক্ষিণে লক্ষ্মণ সিং-এর মনে হল গোচরে বর্ষিত জলটুকু মাটির ভেতর পাঠিয়ে গোচরের দীর্ঘ তৃষ্ণা মেটাতে হবে। কাজটা এমনভাবে করতে হবে যাতে পশুদের গোচরে ঢোকা বন্ধ না হয় ও কারও রাস্তাও না বন্ধ হয়। গোচর খোলা থাকবে। জল এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে ভূ-জলস্তরও বাড়ে। আর মাটির আদ্রর্তা বাড়লে গোচরও সবুজ হয়ে উঠবে।

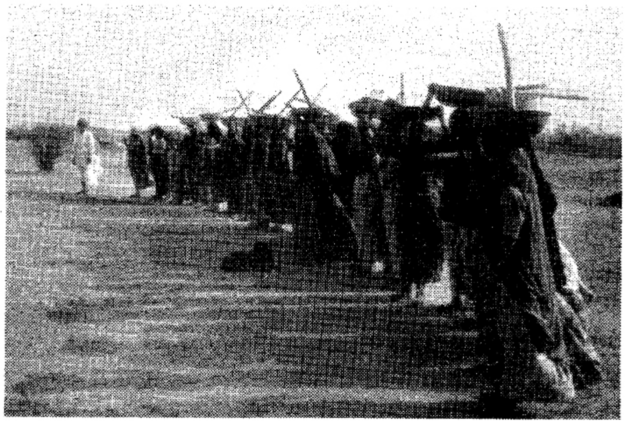

খেতের অভিজ্ঞতা গোচারণ ভূমিতে—

গোচরকে সবুজ করে তোলার প্রবল ইচ্ছে মনে লালন করছে যে মানুষগুলি, পুরুষানুক্রমে তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেচ-জল-মাটির আর্দ্রতার। কিন্তু গোচারণভূমি তো খেত নয়। গোচরে ঘাস, গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় জন্মানোর জন্য যে কৌশল তা তাদের হাতে ছিল না। তার একটা বড় কারণ হল এর আগে গোচারণভূমিতে এরকম কাজ করানোর প্রয়োজন পড়েনি। পুরুষানুক্রমে সবুজ গোচারণভূমি পাওয়া গেছে। অথচ বিগত পর্যায়ে সব নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এখানে নতুন কোন প্রযুক্তি প্রয়োগ না করলে জল দাঁড়াবে না। চাযের অভিজ্ঞতা বলছে— গোচরে জল আটকানো জরুরী নয়; জল তো সংগৃহীত হবে পুকুরে। বর্ষায় দ্রুত বয়ে চলা জলকে এখানে কিছুক্ষণের জন্য আটকাতে হবে, পুরো জলটাই আটকে দিলে ঘাস ভাল হবে না। মাটিতে ততটাই আর্দ্রতা চাই যাতে ঘাসের কোমল শেকড়গুলি জমাট বাঁধতে পারে। একবার ঘাস বেরিয়ে গেলে ততটা জল, ততটাই আর্দ্রতা প্রয়োজন, যাতে সূর্য কিরণের সাথে সেই আর্দ্রতা মিশে ঘাস আরও বড় হতে পারে।

চৌকা দিল সফলতা—

গোচরে কি কি কাজ করতে হবে আর কোন কাজটা করা চলবে না— দুটি বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়ে 'বানাজী' চৌকা শব্দটি খুঁজে বার করলেন। এবার চৌকা যখন গোচরে প্রয়োগ করা হল, তার একটি বাহু বাদ দিয়ে দেওয়া হল। চৌকা বা চতুর্ভূজ একটি বড় বাহু ও দুটি ছোট বাহু- এই রূপ নিয়ে গোচরে স্থান পেল। ***বনাজীর দেওয়া এই উপহার সম্ভবত গোচর বিকাশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।*** বর্তমান আকারে এখন তিনটি বাহু ও দুটি কোণ থাকল, অথচ বর্ষায় যখন জল ভরবে তখন এটি আয়তক্ষেত্র বা চারকোনাই দেখতে লাগবে। তাই নাম চৌকাই থাকল। শুকিয়ে যাওয়া গোচর ঠিক করার দৃঢ় সঙ্কল্প তো ছিলই, সঙ্গে যথেষ্ঠ সাবধানতাও অবলম্বন করা হল। লক্ষ্মণ সিং গ্রামের বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে করে দু-চারবার গোচরে ঘুরলেন। বুঝে নেওয়া হল ঢাল কোনদিকে, কতটা। এবার চৌকা বসিয়ে দেখতে হবে জল কোন দিক দিয়ে বেরোবে। বেরিয়ে যাওয়া জলটুকু কোন পুকুর বা নাড়িতে ভরে নিতে হবে। গোচারণভূমির কাছাকাছি জল চাই। জল দূরে থাকলে দুপুর বেলা পশুগুলিকে জল খাওয়াতে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার গোচরে ফেরা কঠিন । পূর্বজদের সঙ্গে গোচরে ঘোরার সময় এই সব বিষয়গুলি ভালভাবে বুঝে নেওয়া হয়েছে। এবার কাগজে নক্সা হল, কাজ শুরুর আগে নক্সা অনুযায়ী মাটিতে দাগ কাটা হল, কোথায় কতটা মাটি কাটতে হবে, কাটা মাটি কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলা হবে, সবই পরখ করে

দেখে নেওয়া হল। খোঁড়া ও ফেলার জায়গার মধ্যে অন্তত পক্ষে পাঁচ ফুট দূরত্ব রাখা হল। কেননা যেখানে মাটি ফেলা হবে সে জায়গাটি মাটি জমে উঁচু হয়ে উঠবে, এই উচু মাটি বৃষ্টির জলের চাপে ধুয়ে ফের চৌকাগুলি ভরিয়ে দিতে পারে তাই এই অন্তর। অন্তর ও অন্তরা শব্দ আমরা সকলেই শুনেছি। এখানে অন্তরার সঙ্গে আরও একটি শব্দ 'সন্তরা'ও শোনা গেল। অন্তব— মাটির গাদা ও চৌকার মধ্যে দূরত্ব। সন্তরা— খোঁড়া জায়গাগুলির মধ্যে তফাত। সন্তরার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হল। এত সব কিছুর পর এবার চৌকার পালা। সকলে মিলে আলোচনা হল। কাগজে আঁকা ও গোচরে দাগ দেওয়া চৌকা মনে গেঁথে নেওয়া হল।

ঘাসের আগে
জন্ম নিল রাজনীতি—

গ্রামগুলির বর্তমান পরিস্থিতি যা তাতে, চৌকা পদ্ধতির সাহায্যে গ্রামের সাধারণ লোক, কৃষক, পশুপালক, গোয়ালা সকলকেই এক সূত্রে বেঁধে ফেলা যাবে এটা ভেবে নেওয়া মনে হয় খুবই সরল সমাধান হবে। চৌকার কাজ শুরু হতেই, গোচরে ঘাস জন্মাবার আগেই স্বার্থপর নোংরা রাজনীতি জন্ম নিল। তারা চৌকা পদ্ধতির বিরুদ্ধাচারণ করল। রটে গেল সংস্থার লোকেরা গোচর কব্জা করতে চাইছে। যে কয়েকটি গাছ তখনও টিকে ছিল সংস্থা ঠিক করেছিল সেগুলি আর কাটা হবে না, কিন্তু সেগুলির ওপরই কুঠারের চোট পড়ল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েত এদের সঙ্গে যোগ দিল। ১৯৯৫-এর ১৬ই ডিসেম্বরে পঞ্চায়েত মাত্র

দুহাজার টাকায় গোচরের সমস্ত গাছ কেটে দেওয়ার ঠিকা দিয়ে দিল। ঘোষণা করা হল যদি গোচর ঠিক-ঠাক করতে হয়, গোচর বিকাশের কাজ যদি করতেই হয়, তাহলে তা পঞ্চায়েতই করবে।

সত্যতা গ্রামের সঙ্গে ছিল, ছিল সংস্থার সঙ্গে; তাই এই অপ্রিয় পরিস্থিতিতে গ্রামের লোক সত্যের সঙ্গ নিল— গোচরে সত্যাগ্রহ শুরু হল। সময়টা ছিল শীত কাল। স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে ঘুরে ঘুরে গোচর পাহারা দিতে লাগল। দিনের এই পাহারা অবশ্য যথেষ্ট ছিল না, তাই গ্রামের লোকেরা ভয়ঙ্কর ঠান্ডার রাতে ঘর থেকে লেপ কম্বল নিয়ে এসে গোচরে শোয়া শুরু করল। ভবিষ্যতে নিশ্চিন্ত ঘুমের আশায় ১৯৯৫-এর শীতে খোলা আকাশের নীচে লাপোড়িয়ার মানুষ রাত জাগতে থাকল। পালায় পালায় চলল পাহারা। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও তাদের মা, বাবা, কাকা, দাদুদের সঙ্গ দিল। এরপর পুলিস এলো, কালেক্টর এলো, ছোট-বড় সরকারী অফিসারেরা এল; সকলে দুই-পক্ষেরই কথা শুনল, পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল— গোচরে গাছ কাটা বন্ধ করা গেল। পরিবর্তে ঠিক হল, যে গাছ গোচরের ক্ষতি করতে পারে এমন গাছ কেটে ফেলা হবে। ধরিত্রীর ওপর ভাল কাজ শুরু হল, পূণ্য অর্জিত হল, গোচর রক্ষা পেল। এই জমায়েতেই ঠিক হয়ে গেল গোচর থেকে কব্জা উঠিয়ে নেওয়া হবে। জমি জরিপের সরকারী লোকেরা এগিয়ে এলো। গ্রামের নক্সা অনুযায়ী মাপ হল এবং এখানে না বন্ধুত্ব, না পারিবারিক সম্পর্ক কোনটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হল না। লক্ষ্মণজী প্রেমভরে জানিয়ে দিলেন বন্ধুত্ব শুধু গোচরের সঙ্গে, কেননা গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সুখ-শান্তি জড়িয়ে রয়েছে গোচরে। দীর্ঘ দিনের কব্জা ছাড়ানো অবশ্য খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। যার কব্জা ছাড়ানোর চেষ্টা করা হয় সেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই তিক্ততা দূর করতে গোচরে সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হল— লুচি, পায়েস, হালুয়া পরিবেশিত হল, গ্রামের দুশো-পরিবারের প্রায় চারশোজন একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া হল। সহভোজে পরিবেশিত মিষ্টি পায়েস সকল তিক্ততা ভুলিয়ে দিল।

বিদেশী বাবলা দূর করার দেশী উপায়—

সহভোজের পর গোচরে বিদেশী বাবলা পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়। সকলেরইএটা জানা যে গোচর হল গ্রামের পশুদের চরার জায়গা, কিন্তু বিগত বছরগুলিতে গোচরের গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, ঘাস খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। আর এধরণের ভুলগুলিকে কিছুটা চাপা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ন্যাড়া শুকিয়ে যাওয়া গোচরে যাতে চটজলদি কিছু সবুজ নজরে পড়ে তাই বিদেশী বাবলা লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিদেশী

বাবলা তার শেকড় চারিয়ে গোচরে গেড়ে বসল। বিদেশী বাবলা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে কিন্তু কোন পশুই এগুলি খায় না। বিদেশী বাবলার আরও একটি বড় গুণ হল, সে তার নিজের আশপাশে আর কোন চারা জন্মাতে দেয় না। প্রতি মরশুমেই বাবলার ফলগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে - বাবলা তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলে। মিলন ভোজের পর তাই এই বাবলা নির্মূল করার একটি সুন্দর অভিযান শুরু হল। গোচরের সব বিদেশী বাবলা গুণে ফেলা হল, গ্রামের প্রতিটি পরিবার পিছু তা ভাগ করে দেওয়া হল। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০০বাবলা রয়েছে গোচরে। গ্রামে পরিবারের সংখ্যা ২০০। ঠিক হল প্রতিটি পরিবার ৩টি করে গাছ শেকড় শুদ্ধ উপড়ে নেবে। বাবলার শেকড়ের খানিকটা অংশও যদি মাটিতে থেকে যায় তো সে বাড়তে বেশী সময় নেয় না। তাই দেরী না করে আগামী ৩ মাসের মধ্যে বাবলা নির্মুল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বিদেশী বাবলা তুলতে গিয়ে যে গর্ত হল তাতে গ্রামের লোকেরা দেশী বাবলা, কুল ও নানা প্রকার ঘাস লাগিয়ে দিল।

প্রথম বছর চৌকা হয়ে গেলে গ্রামের লোকেরা প্রচুর উৎসাহে বিভিন্ন প্রকার চারা ও ঘাসের বীজ এনে ছড়িয়ে দিল। রেজাল্ট অবশ্য খুব একটা ভাল পাওয়া গেল না। গোচরে যতটা জলের প্রয়োজন ততটাই আটকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বাকি জল চৌকার ক্ষতি না করে সামনে বয়ে চলেছিল, ফলে বীজগুলি সেই জলের সঙ্গে বয়ে চলে গেল। বাইরে থেকে এনে লাগানো বীজগুলি অঙ্কুরিত হতে পেল না ঠিকই কিন্তু মাটির ভেতর সুপ্ত থাকা বীজগুলি জল পেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে লাগল। বর্ষায় পুরো গোচরেই জল ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে জল শুকিয়ে যেতেই ভেজা মাটিতে বিভিন্ন প্রকার চারা ও ঘাস সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিল। ঘাসের যে চারাগুলি কয়েক প্রজন্ম দেখা যায়নি, স্মৃতি থেকেও যে নামগুলি হারিয়ে গেছিল— লাপোড়িয়ার গোচরে সেগুলি একে একে মাথা তুলতে লাগলো। বিদেশী গাছ উচ্ছেদ করা হলেও দেশী গাছ সেভাবে লাগানো হয়নি কিন্তু আর্দ্রতা ছড়িয়ে পড়তেই মাটিতে চাপা পড়ে থাকা পুরোনো শেকড় প্রাণ ফিরে পেল। স্থানে স্থানে ঘাস ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ঝাড়ি, গাছ বেড়ে উঠতে লাগল। প্রকৃতির স্মৃতি থেকে নামগুলি লুপ্ত হয়ে যায়নি তাই লাপোড়িয়ার সমাজের স্মৃতিতেও সেগুলি একে একে ফিরে আসতে লাগল।

সংকল্পের বিস্তার—

গোচর পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প লাপোড়িয়ার মানুষ কাজে পরিণত করে দেখায়। বিস্তারও ঘটে। আশপাশের গ্রামগুলিতে যুব-সংগঠন তৈরী করা হয়। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। গোচর, পুকুর, গাছ ও জীবজন্তুদের কিভাবে রক্ষা করা যায়, তা আলোচনার জন্য

সকলে মিলে বসে। মিছিলও বেরোয়। আশপাশের গ্রামগুলি ছাড়াও ৮৪টি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এই কাজ। উত্থান একাদশীতে পুকুর ও গোচর পূজার কাজ শুরু হয়ে যায়— এরপর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়া। সকলের কাজ সকলকে সঙ্গে নিয়ে ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। তাই গোচর আন্দোলনে এই কথাটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়েছিল যাতে কেউ বাদ না পড়ে। প্রথম প্রথম স্বার্থবশত যদি কেউ এ কাজে যোগ দিতে নাও চায় তাহলে তার জন্য ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করা হয়েছে। তাকে বোঝান হয়েছে— তার হিতও সর্বজনীন হিতের সঙ্গে যুক্ত।

লাপোড়িয়ায় প্রথম থেকেই পুরো গ্রামকে গোচরবিকাশের কাজে যুক্ত করার জন্য কৌশল ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। গাছগুলি এখনও বৃক্ষ হয়ে ওঠেনি, তবে ছোট ছোট গাছ, ঝোপ-ঝাড়গুলি মজবুত হয়ে উঠছে। এগুলি আরও একটু বড় হয়ে ওঠার, বেড়ে ওঠার জন্য পরিবেশ তৈরী করা দরকার। পরিবেশ তৈরী করতে আইনের বদলে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পথ বাছা হল। লাপোড়িয়ার স্ত্রী-পুরুষেরা ছোট ছোট গাছগুলিকে রাখি পরিয়ে, সেগুলিকে রক্ষা করার শপথ নেয়। সম্ভবত গাছগুলিও মনে মনে সঙ্কল্প নেয় লাপোড়িয়াকে রক্ষা করার।

তাইতো আজ ৬ বছরের খরার পরও লাপোড়িয়ার গোচরে এত চারা রয়েছে; গাই-গরুগুলি এত প্রসন্ন রয়েছে যে এই খরার মাঝেও বড় না হোক ছোট-খাটো একটি দুধের নদী লাপোড়িয়ার ওপর বয়ে যেতে পারে। এখন প্রতিদিন ৪০ক্যান অর্থাৎ প্রায়

১৬০০লিটার দুধ হচ্ছে। বাচ্চাদের খাওয়া, ঘর-পরিবারের প্রয়োজন মেটার পরই দুধ বিক্রি হয়। জয়পুর ডেয়ারী প্রতিমাসে ২ $\frac{১}{২}$ লাখ টাকার দুধ কেনে। লাপোড়িয়ার মত একটি ছোট্ট গ্রাম আজ বছরে প্রায় ৩০ লাখ টাকার দুধ উৎপাদন করছে । এটা সম্ভব হয়েছে গ্রামে গাছপালা-চারা ফিরে আসাতেই ।

শুকিয়ে যাওয়া গোচরে না জানি কত প্রকার চারা ফিরে গজিয়েছে চৌকা পদ্ধতির ফলে। এত প্রকার চারা যে এখন কেউ গোচরে ঢুকলে সেগুলির নাম জিজ্ঞাসা করে, কেউ কেউ বা বলারও চেষ্টা করে। লাপোড়িয়ার গোচর বনস্পতি শাস্ত্রের নতুন পাঠশালা হয়ে উঠেছে। পশুপালক, গোয়ালা বা কৃষকদের কেউ যদি চারটি চারার নাম বলে তো কেউ বলবে তাদের গুণাগুণের কথা, কেউবা লাভের কথা, কেউবা আবার এসব বাদ দিয়ে বর্ণনা করবে তাদের স্বভাব। সে বর্ণনা এমনই যেন চারাটি তার পরিবারেরই সদস্য। লাপোড়িয়ার গোচরে এখন পুরোনো নামের ভিড়, নতুনেরা তাই পিছনে পড়ে গেছে।

শুধু ঘাস বা চারা নয় নজর দেওয়া হয়েছিল গাছের ওপরও। গ্রামের সকল পরিবার মিলে বিদেশী বাবলা নির্মুল করার পর প্রকৃতি এখন কিছুটা সুস্থির। এদিকে গোচরে আদ্রর্তা ফিরে আসতেই বিভিন্ন প্রকার গাছ মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। এগুলি নির্দিষ্ট কোন স্থানে বেরোবে এমন তো নয়, যেখানেই উঠুক লাপোড়িয়ার মানুষ ধৈর্য্য সহকারে সেগুলি বেড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরী করে দিচ্ছে। তারজন্য অবশ্য পশুদের গোচরে যাওয়া একদিনের জন্যও বন্ধ করা হয়নি। গ্রামের মানুষের বক্তব্য ছিল গরু বা পশু গোচরের শত্রু নয়, তারা গোচরের বন্ধু। তাদের বন্ধুত্বই গোচরকে সবুজ করে রাখবে। গরুর গোবরে, ছাগল ও খরগোশের লাদিতে বিভিন্ন ধরণের ঘাস ও গাছের বীজ থাকে। পশু-পাখির পেটের রাসায়নিক ক্রিয়া বীজগুলিকে নরম করে এবং বিষ্ঠা-লাদাড়ি বীজের চারপাশে সারের কাজ করে। বিষ্ঠা-লাদাড়ি গোচরের চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। চৌকায় জল ভরার ফলে নিজের নিজের ওজন অনুযায়ী এগুলি ভেসে চলে ও এক জায়গায় গিয়ে আটকে যায়। ভেজা মাটি ও রোদ অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করে।

গোচর বিকাশের প্রাথমিক এই কাজগুলির সঙ্গে সঙ্গেই লাপোড়িয়ার নজর যায় পূর্ণ বিকাশের দিকে। বিগত সময় গ্রাম যে পরম্পরা, যে জ্ঞান বা অনুশাসনগুলি ভুলে গিয়েছে, হারিয়ে ফেলেছে; তার খণ্ড অংশ যখন ফিরে আসতে শুরু করেছে, তখন তার পূর্ণ রূপ পূর্ণ দর্শনের স্মৃতিও ফিরে আসতে থাকে।

আজ লাপোড়িয়ায় পশুর সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে পাখির সংখ্যা ও প্রজাতি। অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের জীবজন্তু দেখা যাচ্ছে। ময়ূর, কোকিল, পিউকাঁহা..., খরগোস,

নেউল, জঙ্গলী বেড়াল..., বিভিন্ন প্রকার বন্ধু কীট-পতঙ্গ গোচর ও ক্ষেতে দেখা যাচ্ছে। গৃহস্থের দেওয়ালে যে পশু-পাখির ছবি আঁকা হত সেগুলি আজ দেওয়াল থেকে নেমে লাপোডিয়াময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিছু গ্রামের মানুষ নিজেরাই লাপোডিয়ার গোচর বিকাশের কাজ দেখতে আসে, আর কিছু গ্রামে লাপোডিয়ার মানুষ যায়। অভিজ্ঞতা, অনুভবের আদানপ্রদান হয়; এভাবেই ধীরে ধীরে অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে গোচর বিকাশের কাজ। তবে শুধুমাত্র চৌকা করে ফেললেই কাজটি সম্পূর্ণ হয় না, এর সফলতার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে সমাজ সংগঠনে। ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপরে না উঠতে পারলে এরকম সংগঠন সম্ভব নয়।

লাপোডিয়া ঘাম ঝরিয়ে গ্রামের পুকুর ও গোচারণভূমিতে যে জলটুকু আটকাতে পেরেছে তা লাপোডিয়াকে সবুজ করে তুলেছে। এই সবুজের ছোঁয়া মানুষের মনেও লেগেছে। এখন তারা মনে করছে কাজ শুরু করতে গিয়ে কয়েক বছর আগে যে সংঘর্ষ করেছে, যে আন্দোলন করেছে, অনান্য গ্রামগুলিরও তা করা প্রয়োজন। গ্রামের মনকে হরিৎ করার কাজ অন্তরে ও সহযোগিতার ভিত্তির ওপর গড়ে উঠতে হবে।

লাপোডিয়ার গোচর সংরক্ষণ আন্দোলন এবং বর্তমানে অনান্য গ্রামে তার বিস্তার আমাদের এই কথাই স্মরণ করায় যে বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা অপেক্ষাকৃত কম কঠিন কাজ। লড়াই যখন নিজেদের মধ্যে, নিজের গ্রামের লোকেদের মধ্যে,

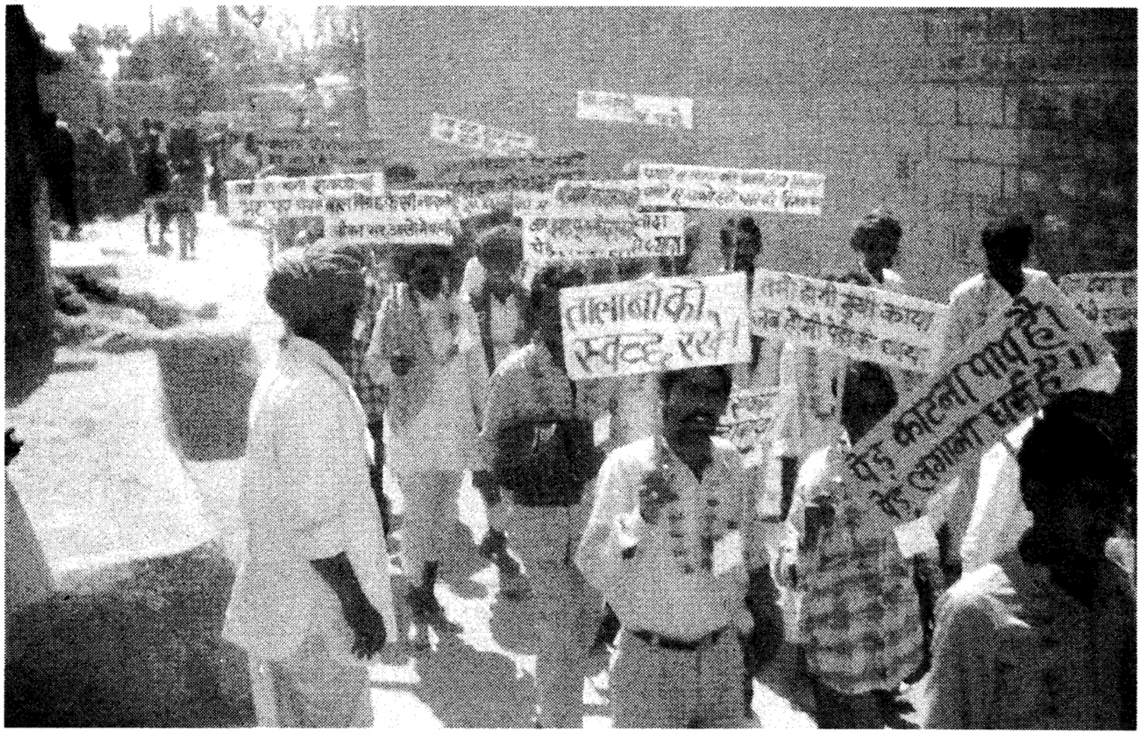

আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে তখন এক অন্য ধরণের পরীক্ষা সামনে দেখা যায়। সংঘর্ষের স্বরূপটিকে এখানে বিরোধী স্লোগান, ধরনা জুলুম-এর থেকে ওপরে উঠতে হয়। নিজেকে শুধরে গ্রামকে শুধারতে হয়। সকলেই মালিক থাকবে কিন্তু সেবকের ধারণাটিও যেন মনে সদা বিরাজ করে- যদি এটা করতে হয়, তাহলে যাদের মধ্যে সংঘর্ষ তাদেরও সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

জলস্তর ওপরে ওঠার জন্য লাপোড়িয়ার অনেক কৃষক একবিঘা, দুইবিঘা জমিতে সবুজ চারার চাষ করছে। এই ফসলের পরিমানটা খুব একটা কম নয়। সারা বছর, বারো মাস অর্থাৎ তিনশো পঁয়শট্টি দিন প্রায় একমন চারা প্রতিদিন পাওয়া নিজের প্রতি নিজের এ এক বড় উপলব্ধি। সেটাও আবার সেই গ্রামে যে গ্রাম পর পর ছয় বছর খরা ভোগ করেছে।

আজ ২০০ঘরের ছোট্ট লাপোড়িয়া গ্রামের রাস্তা, গলি বা চৌমাথায় কোন জননেতার নাম শুনতে পাবেন না। আপনি হঠাৎ গিয়ে যদি লাপোড়িয়া পৌছান শুনবেন— রামকরণ দাদা, কালু দাদা, রামকরণ মামা আর ওদের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতিরা মিলে বেরিয়ে পড়েছেন আশপাশের কোন গ্রামে বা সেটা দূরের কোন গ্রামও হতে পারে। সেই গ্রামের লোকেদের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসেছেন কিভাবে তারাও লাপোড়িয়ার মতো পুকুর, গোচারণের প্রসাদ পেতে পারে। লাপোড়িয়া সুস্থ চিন্তার সুন্দর কাজ শুধু নিজেদের মধ্যে না রেখে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

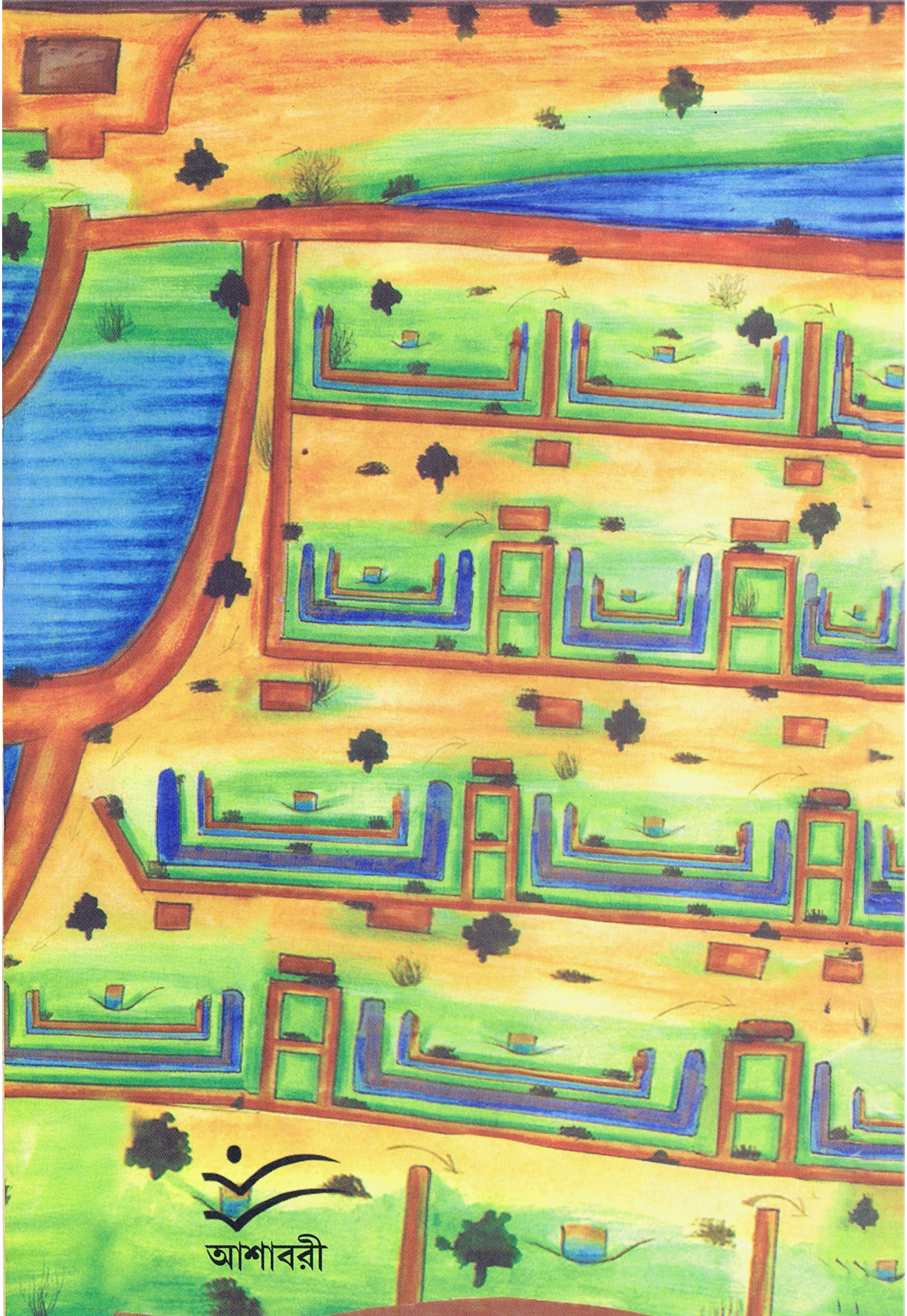
আশাবরী